হিমায়িত চিংড়ি বছরে ১০ হাজার কোটি টাকা রপ্তানির সম্ভাবনা

লিখেছেন হাসান মূর্তাজা/পারভীন তানী

বাংলাদেশের স্বর্ণের কোনো খনি নেই। তারপরেও 'স্বর্ণ' রপ্তানি করে বাংলাদেশ বছরে প্রায় ২ হাজার কোটি টাকা আয় করে। দেশের দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলীয় উপকূলবর্তী অঞ্চলে রয়েছে 'স্বর্ণের খনি'। এই খনিগুলোতে পাওয়া যায় 'শ্বেতস্বর্ণ'।

হিমায়িত চিংড়ি বাংলাদেশের সেই শ্বেতস্বর্ণ। দেশের বৈদেশিক মুদ্রা আয়ের দ্বিতীয় বৃহত্তম উৎস। বৈদেশিক মুদ্রা আয়ের এই খাতটি এতোটাই সম্ভাবনাময় যে, কয়েকটি বিষয় নিশ্চিত করা সম্ভব হলে আগামী চার বছরের মধ্যেই হিমায়িত চিংড়ি রপ্তানি করে বছরে ১০ হাজার কোটি টাকা আয় সম্ভব।

বাংলাদেশের রপ্তানি পণ্য মূলত দুই শ্রেণীতে বিভক্ত। প্রাথমিক পণ্য ও শিল্পজাত পণ্য। প্রাথমিক পণ্যের মধ্যে আছে চা, হিমায়িত খাদ্য, কৃষিজাত পণ্য, কাঁচা পাট ইত্যাদি। অন্যদিকে শিল্পজাত পণ্যের মধ্যে পাটজাত পণ্য, চামড়া, তৈরি পোশাক, হস্তশিল্প, ফার্নেস অয়েল এবং অন্যান্য শিল্প পণ্য। এসব পণ্যের মধ্যে পাট ও পাটজাত দ্রব্য, চা, চামড়া ছিল এক সময়ের বিপুল সম্ভাবনাময় রপ্তানি পণ্য। এসব পণ্য থেকে বাংলাদেশ আয় করতো প্রচুর পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা। এগুলো এখন ইতিহাস।

এখন উল্লেখ করার মতো আছে তৈরি পোশাক, নিটওয়্যার ও হিমায়িত চিংড়ি। তৈরি পোশাক নিয়ে নতুন করে বলার কিছুই নেই। ২০০৫ সালের ১ জানুয়ারি থেকে মার্কিন বাজারে জিএসপি সুবিধা বন্ধ হবার পর এই সেক্টরে বড় রকমের ধস নামার আশঙ্কা রয়েছে। সে ক্ষেত্রে চলে আসে হিমায়িত চিংড়ির উজ্জ্বল সম্ভাবনার কথা।

চিংড়ি রপ্তানি আয় : বছরে আয় হবে ১০ হাজার কোটি টাকা

স্বাধীনতার পরপরই বাংলাদেশ বিশ্ববাজারে হিমায়িত মৎস্য রপ্তানি শুরু করে। ১৯৭২-৭৩ অর্থবছরে মার্কিন বাজারে রপ্তানিকৃত মৎস্যের অর্থমূল্য ছিল প্রায় ৩২ লাখ মার্কিন ডলার। বর্তমান বাজারমূল্যে প্রায় ২০ কোটি টাকা। পক্ষান্তরে ২০০২-০৩ অর্থবছরে শুধু হিমায়িত চিংড়ি রপ্তানি থেকে আয়ের পরিমাণ ১ হাজার ৮৬৩ কোটি টাকা। ২০০৩-০৪ অর্থবছরে রপ্তানি লক্ষ্যমাত্রা ধরা হয়েছিল ৩৭০ মিলিয়ন ডলার বা প্রায় ২ হাজার কোটি টাকা। অর্থবছর শেষে রপ্তানির পরিমাণ দাঁড়িয়েছে প্রায় ২২০০ কোটি টাকা রপ্তানির ধারাবাহিকতায় ৩০ বছরে হিমায়িত চিংড়ি রপ্তানি থেকে আয় বেড়েছে প্রায় ১০০ গুণ।

দেশে হিমায়িত রপ্তানিকারকদের একমাত্র সংগঠন 'বাংলাদেশ ফ্রোজেন ফুডস এক্সপোর্টার্স এসোসিয়েশন' (বিএফএফইএ) সম্প্রতি

বাংলাদেশ থেকে ফ্রোজেন খাদ্য রপ্তানি ১৯৭২-২০০২

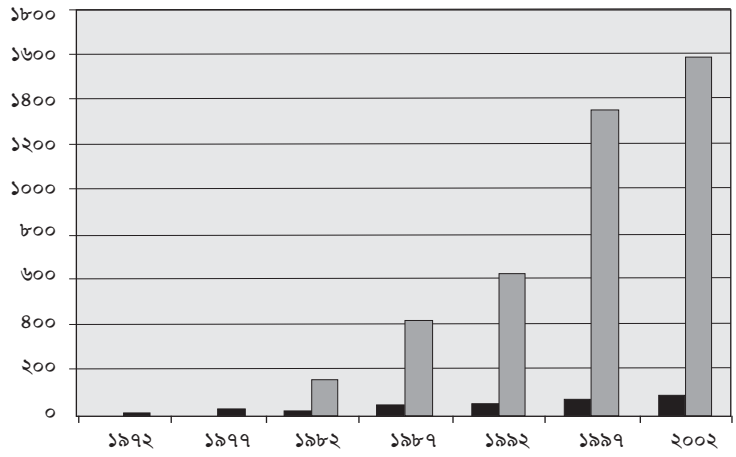

২০০৮ সাল নাগাদ হিমায়িত চিংড়ির রপ্তানির পরিমাণ বাড়িয়ে আয় ১০ হাজার কোটি টাকায় উন্নীত করা সম্ভব। আপাতদৃষ্টিতে পরিকল্পনাটি উচ্চাভিলাষী মনে হলেও মনে রাখা প্রয়োজন, গত ৩০ বছরে বাংলাদেশের হিমায়িত মৎস্যের রপ্তানি বেড়েছে বছরে গড়ে ৩ শতাংশের বেশি। পক্ষান্তরে রপ্তানি লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে আগামী ৪ বছরে রপ্তানি আয় বাড়াতে হবে ৫ গুণ

সরকারের কাছে একটি কনসেপ্ট পেপার পেশ করেছে। 'ভিশন-২০০৮' নামে এই প্রস্তাবে বলা হয়েছে, ২০০৮ সাল নাগাদ হিমায়িত চিংড়ির রপ্তানির পরিমাণ বাড়িয়ে আয় ১০ হাজার কোটি টাকায় উন্নীত করা সম্ভব। আপাতদৃষ্টিতে পরিকল্পনাটি উচ্চাভিলাষী মনে হলেও মনে রাখা প্রয়োজন, গত ৩০ বছরে বাংলাদেশের হিমায়িত মৎস্যের রপ্তানি বেড়েছে বছরে গড়ে ৩ শতাংশের বেশি। পক্ষান্তরে রপ্তানি লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে আগামী ৪ বছরে রপ্তানি আয় বাড়াতে হবে ৫ গুণ। এ বছর বাংলাদেশের রপ্তানি আয় বেড়েছে ১১ ভাগ। দেশের বাৎসরিক রপ্তানি বৃদ্ধির হার অব্যাহত থাকলে খুব সহজেই এ লক্ষ্যমাত্রা অর্জন সম্ভব।

বর্তমানে খুলনা, সাতক্ষীরা, বাগেরহাট, নোয়াখালী, চট্টগ্রাম ও কক্সবাজারের প্রায় ১ লাখ ৩০ হাজার হেক্টর জমিতে চিংড়ি চাষ হচ্ছে। দেশের ৫০টি হ্যাচারিতে প্রতি মৌসুমে ৫০০ কোটি পোনা জন্ম নিলেও গড় বাৎসরিক উৎপাদন মাত্র ৩০ হাজার মেট্রিক টন। অথচ থাইল্যান্ড বাংলাদেশের চেয়ে অর্ধেক জমিতে চিংড়ি চাষ করলেও উৎপাদন করে ৯ গুণেরও বেশি। ২০০৩ সালে দেশটির চিংড়ি উৎপাদনের পরিমাণ ২ লাখ ৮০ হাজার মেট্রিক টন।

সংশ্লিষ্ট সূত্র মতে, হ্যাচারিগুলোতে ২০০৮ সালের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের মতো পর্যাপ্ত সংখ্যক পোনা জন্ম নিলেও কম উৎপাদন হারের কারণে বাংলাদেশ রপ্তানি বাড়াতে পারছে না। ফলে দেশের ১২৮টি চিংড়ি প্রস্তুতকারক ফ্যাক্টরির মোট উৎপাদন ক্ষমতার মাত্র ২০-৩০ শতাংশ ব্যবহৃত হচ্ছে। থাইল্যান্ডে হেক্টর প্রতি উৎপাদন প্রায় ২০০০ কেজি। ভিয়েতনামে ৭৭০-৮০০ কেজি। অথচ বাংলাদেশের উৎপাদন মাত্র ১৮০ কেজি।

উৎপাদন কম হবার অন্যতম কারণ সনাতন চাষ পদ্ধতি, চাষীদের অদক্ষতা, রেণু পোনার সংকট, মাছের মড়ক, বিদ্যুৎ ও অবকাঠামোগত সমস্যা ইত্যাদি। বাংলাদেশের চিংড়ি ঘেরগুলোতে এখনও আধুনিক কিংবা নিদেনপক্ষে উন্নত সনাতন চাষ পদ্ধতির প্রবর্তন সম্ভব হয়নি। নদীবন্দর, সুন্দরবনের নদীসমূহ ও সাগর উপকূলে রেণু পোনা সংগ্রহ নিষিদ্ধ। সমুদ্র থেকে মা চিংড়ি বা ব্রুড স্টক এনে হ্যাচারিতে ডিম ফোটানো ও পোনা সংগ্রহ করা হয়। কিন্তু হ্যাচারির পোনা প্রাকৃতিক পরিবেশে জন্ম নেয়া পোনার মতো স্বাস্থ্যবান না হওয়ায় এদের মৃত্যুহার বেশি। এ ছাড়া ভাইরাস থাকায় অনেক ক্ষেত্রে হ্যাচারির পোনার ৭০-৭৫ ভাগও মারা যায়। একই কারণে ঘেরে মড়কও লাগে। অনেক ক্ষেত্রে শত্রুতাবশত ঘেরে বিষ প্রয়োগের ঘটনাও ঘটে। বাংলাদেশে চিংড়ি ঘেরগুলোতে যে খাবার দেয়া হয় সেই ফিড মিলও আসে বাইরে থেকে। দেশে উৎপাদন না হওয়ায় ব্যয়বহুল এই খাবার আমদানির কারণে আমাদের চিংড়ি উৎপাদন খরচ বেড়ে যায়। উপরন্তু, বিদ্যুৎ ও অবকাঠামোগত সংকট তো রয়েছেই। এই নেতিবাচক দিকগুলো কাটিয়ে উঠতে না পারায় বাংলাদেশের চিংড়ি উৎপাদন বৃদ্ধি পাচ্ছে না।

দেশের চিংড়ি রপ্তানি আয় মিলিয়ন থেকে বিলিয়ন ডলারে নিয়ে যাওয়ার জন্য প্রতি বছর আড়াই লাখ মেট্রিক টন চিংড়ি উৎপাদন প্রয়োজন। এ জন্য ঘেরগুলোতে উৎপাদন বাড়ানোর পাশাপাশি চাষের জমিও বৃদ্ধি করতে হবে। দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলের ১ লাখ হেক্টর জমি এখনো অনাবাদী পড়ে রয়েছে, যেখানে চিংড়ি চাষ সম্ভব। হিমায়িত খাদ্য রপ্তানিকারকেরা '৯১ সালে এই জমি বরাদ্দ ও বন্টনের জন্য সরকারের কাছে একটি প্রস্তাব দিলেও আমলাতান্ত্রিক জটিলতা ও সরকারের বিভিন্ন দপ্তরের মধ্যে সমন্বয়হীনতার কারণে জমি বিতরণ সম্ভব হয়নি। অবশ্য বিশেষজ্ঞরা মনে করেন, অতীতের মতো সরকারি খাস জমি বন্টনে স্বজনপ্রীতি ও দলীয় বিবেচনা প্রাধান্য পেলে দেশের রপ্তানি বৃদ্ধির আসল উদ্দেশ্য বাধাগ্রস্ত হবে। উপরন্তু, চিংড়ি চাষ ছাড়াও বনায়ন, রাবার বাগানের জন্য অতীতে খাস জমি বন্টনের পর দেখা গেছে বরাদ্দপ্রাপ্তদের অনেকে নির্দিষ্ট খাতে এই জমির ব্যবহার করেনি। সংশ্লিষ্টরা তাই প্রকৃত উদ্যোক্তাদের হাতেই জমি হস্তান্তরের ওপর গুরুত্ব দিচ্ছেন।

বাংলাদেশে মূলত ব্ল্যাক টাইগার অর্থাৎ গলদা জাতীয় চিংড়ি উৎপাদিত হয়। এই জাত আকৃতিতে বড় এবং ওজনও বেশি। প্রতি পাউন্ডে ১৫-১৭টি চিংড়ি ধরে। পক্ষান্তরে, চীন, থাইল্যান্ড, ভিয়েতনামসহ বিশ্বের সর্বোচ্চ চিংড়ি উৎপাদনকারী দেশগুলো 'পিনেআস ভানামাই' নামে সাদা চিংড়ির একটি জাতের উৎপাদন বিশেষভাবে করছে। দক্ষিণ আমেরিকার এই জাত ১৯৯৫ সালে চীন প্রথম উৎপাদন করে বাণিজ্যিকভাবে। থাইল্যান্ডে শুরু হয় ১৯৯৮ সালে। আকৃতিতে ছোট কিন্তু অতিমাত্রায় উৎপাদনশীল হওয়ায় থাই সরকার এই জাতের মা চিংড়ি আমদানি করে। প্রথম দিকে থাইল্যান্ডে হোয়াইট শ্রিম্পের উৎপাদন ২০ হাজার টন থাকলেও ২০০৩ সাল নাগাদ উৎপাদন বেড়ে দাঁড়ায় দেড় লাখ টনে। থাই সরকার আশা করছে এ বছর নাগাদ তাদের উৎপাদন প্রায় আড়াই লাখে পৌঁছবে।

ভানামাই জাতের চিংড়ি পোনার বেঁচে থাকার হার প্রায় ৮০-৯০ ভাগ। দ্রুত বর্ধনশীল। এই জাত চাষে থাই সরকারের মৎস্য খাদ্যের পেছনে খরচ কমেছে ৫৫ ভাগ এবং সামগ্রিক

বাংলাদেশের চিংড়ি আমদানিকারক দেশসমূহ ২০০১-২০০২

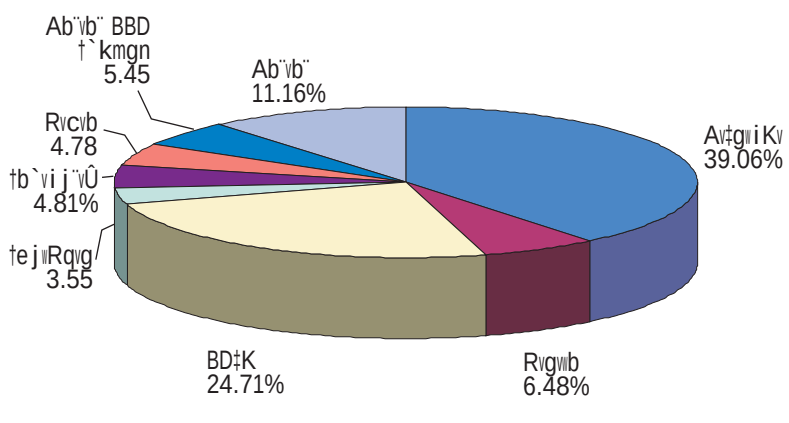

উৎপাদন খরচ কমেছে দুই থেকে আড়াই ভাগ। থাইল্যান্ডে ২০০২ সালের ব্ল্যাক টাইগার ও হোয়াইট শ্রিম্পের উৎপাদনের অনুপাত ৮০ঃ২০ থাকলেও ২০০৩ সালে তা ৫০ঃ৫০ হয়ে যায়। সম্প্রতি ভারতেও হোয়াইট শ্রিম্প চাষ শুরু হয়েছে। অথচ বাংলাদেশের কোথাও এই জাতের চিংড়ি উৎপাদন করা হয় না। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, দেশে চিংড়ি উৎপাদন বাড়িয়ে রপ্তানি আয় বৃদ্ধি করতে চাইলে হোয়াইট শ্রিম্পের মতো উৎপাদনশীল জাতের চিংড়ি চাষ করা যেতে পারে। যদিও বিএফএফইএ'র প্রস্তাবিত 'ভিশন-২০০৮' পেপারে এই বিষয়টি উল্লেখ করা হয়নি।

চিংড়ি রপ্তানির ক্ষেত্রে মাননিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থাটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ১৯৯৭ সালে ইউরোপীয় ইউনিয়ন বাংলাদেশ থেকে ৩ মাসের জন্য মৎস্য আমদানি স্থগিত করেছিল। বর্তমানে আমাদের দেশে আন্তর্জাতিক মাননিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি 'হেসাপ' (Hazard Analysis and Critical Control Point) মেনে চলা হচ্ছে। মূলত মৎস্য প্রক্রিয়াকরণ থেকে রপ্তানির প্রতিটি স্তরে এই পদ্ধতি অনুসরণ করা হলো প্রাক-প্রস্তুতিকরণ স্তরে তেমন তদারকি নেই। এ বছরের সেপ্টেম্বরে যুক্তরাষ্ট্রের খাদ্য ও ওষুধ পরিদপ্তরের (ইউএফএফডিএ) একদল পরিদর্শক বাংলাদেশে আসছে মাননিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা সরেজমিন প্রত্যক্ষ করতে। সর্বশেষ মার্কিন পরিদর্শক দল বাংলাদেশে এসেছিল প্রায় এক যুগ আগে। এবারের সফরটি বেশ গুরুত্বপূর্ণ। কেননা যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশের হিমায়িত মৎস্যের একক বৃহত্তম ক্রেতা। বাংলাদেশের রপ্তানির প্রায় ৪০ শতাংশ যায় যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে। ২০০১ সালের ১১ সেপ্টেম্বরের পর যুক্তরাষ্ট্র জৈব সন্ত্রাস বা বায়োটেররিজম আইন প্রণয়ন করে। ফলে খাদ্য ও হিমায়িত পণ্য আমদানিতে কড়াকড়ি আরোপ করা হয়। তবে রপ্তানিকারক সমিতি সূত্রে জানা গেছে, বাংলাদেশ যুক্তরাষ্ট্রের বেঁধে দেয়া মান বজায় রাখতে পারার ব্যাপারে আশাবাদী।

সেই লক্ষ্যে ঢাকা, চট্টগ্রাম ও খুলনা এলাকার মাননিয়ন্ত্রণ ল্যাবরেটরিগুলো ৫ কোটি টাকা ব্যয়ে আধুনিকায়ন করা হয়েছে। সামুদ্রিক খাদ্যে ক্ষতিকর রাসায়নিক পাওয়ায় সম্প্রতি ইউরোপীয় ইউনিয়ন বেশ কটি ভারতীয় চালান ফেরত পাঠিয়েছে। এছাড়া সামুদ্রিক জলজ প্রাণীর ক্ষতি হওয়ায় ইউএসএফডিএ থাইল্যান্ডের সমুদ্র থেকে আহরিত চিংড়ি রপ্তানির ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছে। এ জন্য সংশ্লিষ্টরা মনে করছেন, রপ্তানি যেন বাধাগ্রস্ত না হয় সে জন্য উৎপাদনের একেবারে প্রাথমিক পর্যায় থেকে 'মাননিয়ন্ত্রিত' তথা হেসাপ মেনে চলা জরুরি। উল্লেখ্য, '৯৭ সালে বাংলাদেশের সঙ্গে পাকিস্তানের মৎস্য রপ্তানি নিষিদ্ধ করা হয়েছিল। মান নিয়ন্ত্রণ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ না হতে পারার কারণে আজও এই নিষেধাজ্ঞা তুলে নেয়া হয়নি।

১৯৯৭ সালে ইউরোপীয় ইউনিয়ন বাংলাদেশ থেকে ৩ মাসের জন্য মৎস্য আমদানি স্থগিত করেছিল। বর্তমানে আমাদের দেশে আন্তর্জাতিক মাননিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি 'হেসাপ' (Hazard Analysis and Critical Control Point) মেনে চলা হচ্ছে। মূলত মৎস্য প্রক্রিয়াকরণ থেকে রপ্তানির প্রতিটি স্তরে এই পদ্ধতি অনুসরণ করা হলো প্রাক-প্রস্তুতিকরণ স্তরে তেমন তদারকি নেই

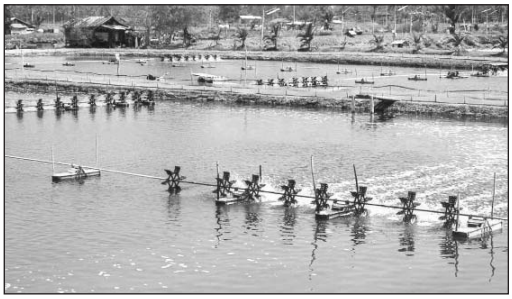

প্রধান রপ্তানিকারক দেশ

চিংড়ির বিশ্ব বাজার অত্যন্ত প্রতিযোগিতামূলক। চিংড়ি রপ্তানিতে বিশ্বে এক নম্বর স্থান দখল করে আছে থাইল্যান্ড। প্রধান চিংড়ি আমদানিকারক দেশ আমেরিকা তার মোট আমদানির এক-চতুর্থাংশ আমদানি করে থাইল্যান্ড থেকে। শুধু তাই নয়, থাইল্যান্ড তার মোট উৎপাদনের ৭৫ ভাগ রপ্তানি করে।

অথচ থাইল্যান্ডের চিংড়ি শিল্পের বয়স খুব বেশি দিনের নয়। ১৯৮০ সালের মাঝামাঝিতে এর বিস্তার ঘটে। এরপর থেকেই দেশটির চিংড়ি উৎপাদন দ্রুত বাড়তে থাকে। ১৯৮৬ সালে ১,২০,৪১৩ টন এবং ১৯৯৮ সালে ৩,৬৪,৭৯৬ টন উৎপাদন করে। অবশেষে ১৯৯২ সালে থাইল্যান্ড সর্ববৃহৎ চিংড়ি রপ্তানিকারক দেশে পরিণত হয়।

থাইল্যান্ডের উপকূলীয় এলাকায় ব্যাপক ভাবে আধুনিক পদ্ধতিতে চিংড়ির চাষ হওয়ায় দেশটি আজ বিশ্বে এক নম্বর চিংড়ি রপ্তানিকারক দেশে পরিণত হয়েছে। বিশেষ করে হোয়াইট শ্রিম্প প্রজাতির চিংড়ি। আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার কারণে থাইল্যান্ডের চিংড়ি উৎপাদন ভবিষ্যতে আরও বাড়াবে। এ লক্ষ্যে 'থাই মেরিন শ্রিম্প প্রোডিউসার এসোসিয়েশন' থাইল্যান্ডের বিভিন্ন প্রদেশের চিংড়ি ফার্মগুলোকে সর্বোচ্চ সহযোগিতা করছে। মান নিয়ন্ত্রণ, পর্যবেক্ষণ এবং রপ্তানির কার্যপ্রণালী পদ্ধতিতে তারা 'হ্যাসাপ' মেনে চলে।

থাইল্যান্ডের পর চিংড়ি রপ্তানিতে শীর্ষে রয়েছে চীন। তবে চীনের প্রধান বাজার আমেরিকা। সামগ্রিকভাবে বিশ্বে রপ্তানিতে ২য় ও ৩য় স্থানে আছে ইন্দোনেশিয়া এবং ইকুয়েডর। তবে এই দুটি দেশ আধুনিক প্রযুক্তির অভাবে আমেরিকা ও ইউরোপিয়ান ইউনিয়নে চিংড়ি রপ্তানিতে পিছিয়ে আছে।

ভিয়েতনাম, থাইল্যান্ড, ভারত, মেক্সিকো মূলত বড় আকৃতির হিমায়িত চিংড়ি রপ্তানি করে। ইকুয়েডর ও ব্রাজিল ছোট চিংড়ি রপ্তানি করে। একমাত্র থাইল্যান্ড সব আকারের হিমায়িত চিংড়ি রপ্তানি করে থাকে। তবে এ সমস্ত চিংড়িই খোসাসহ রপ্তানি করা হয়।

অন্যদিকে খোসা ছাড়া চিংড়ি রপ্তানি করে থাকে চীন, থাইল্যান্ড, ভারত, ভিয়েতনাম। মোট রপ্তানির ৭৫ ভাগ খোসা ছাড়া হিমায়িত চিংড়ি এই দেশগুলো রপ্তানি করে থাকে।

প্রধান বাজার

চিংড়ি আমদানির ক্ষেত্রে প্রধান দুটি দেশ আমেরিকা ও জাপান। রপ্তানিকারক দেশগুলো তাদের সবচেয়ে বড় অংশটি রপ্তানি করে এই দুটি দেশে।

আমেরিকার খাদ্য তালিকায় সিফুড বেশ জনপ্রিয়। এর মধ্যে শীর্ষদশ খাদ্যের অন্যতম ব্ল্যাক টাইগার ও সাদা চিংড়ি। জনপ্রিয়তার কারণে আমেরিকা মূলত এই দুই প্রকারই আমদানি করে থাকে বেশি। ২০০২ সালে আমেরিকার চিংড়ির আমদানি ছিল ২৮৯৬৬ মেট্রিন টন যা পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় ৭ ভাগ বেশি। আমেরিকা প্রধানত থাইল্যান্ড ও চীন থেকে চিংড়ি আমদানি করে।

চিংড়ি আমদানিতে জাপান বর্তমানে দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে। গত এক দশকের অর্থনৈতিক মন্দার কারণে দেশটির জনগণের বাৎসরিক চিংড়ি গ্রহণ মাথাপিছু ৩ কেজির নিচে নেমে গেছে। তারা মূলত বিভিন্ন উৎসব এবং ছুটিতে খাদ্য তালিকায় চিংড়িকে প্রাধান্য দেয় । জাপান সাধারণত বড় ও মাঝারি আকারের চিংড়ি আমদানি করে। ২০০৩ সালে জাপান প্রতি মাসে গড়ে ২০,০০০ মেট্রিক টন আমদানি করে। দেশটিতে মূলত ভিয়েতনাম এবং চীন থেকে চিংড়ি আমদানি করা হয়। চীন থেকে আমদানি হয় ৩১.৩% এবং ভিয়েতনাম থেকে ১৬.৪%।

হিমায়িত চিংড়ির আন্তর্জাতিক বাজার ক্রমশ প্রসারিত হচ্ছে। কিন্তু নতুন নতুন বাজার ধরার ব্যাপারে আমাদের বিদেশী মিশনগুলো বলতে গেলে নিষ্ক্রিয়। সম্প্রতি বেলজিয়ামে ইউরোপিয়ান সি-ফুড এক্সপোজিশনে অংশ নিয়ে বাংলাদেশ তাৎক্ষণিকভাবে ১০ কোটি টাকার বেশি অর্ডার লাভ করেছে। রপ্তানিকারক সমিতি মনে করে, এভাবে আমাদের বাজার বৃদ্ধি করা সম্ভব। এ ছাড়া চীন, ইকুয়েডর, ভারত, ব্রাজিল, ভিয়েতনাম ও থাইল্যান্ডের মতো সর্বোচ্চ উৎপাদনকারী দেশগুলোর এন্টি-ডাম্পিং নীতির কারণে বাংলাদেশ ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। সরকার উদ্যোগী হয়ে আন্তর্জাতিক আইনের আশ্রয় নিলে বাংলাদেশের বাজার আরো প্রসারিত হতো।